দ্বীনী বিষয়ে

বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি

■ সংশোধনের দায়িত্ব কাদের

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী

দ্বীনী বিষয়ে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি

সংশোধনের দায়িত্ব কাদের?

অনুবাদ
মাওলানা মহিউদ্দিন আহমদ

পরিবেশনায়
ইদ্‌রীসিয়া কুতুবখানা
মাদ্‌রাসা রোড, মাদানীনগর, সানারপাড়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭১৬-৯৮৭৯৮০, ০১৮১৬-৪২৪১৬৬, ০১৭১১-৩৭৭১৮৯

দ্বীনী বিষয়ে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি
সংশোধনের দায়িত্ব কাদের?

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী

অনুবাদ : মাওলানা মহিউদ্দিন আহমদ

প্রকাশনায়
ইদ্‌রীসিয়া কুতুবখানা

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১১ ঈ.

মূল্য : ২৪ টাকা

আল-ইনতিসাব

আমার সেই সকল সতীর্থের সুন্দর জীবন কামনায়।
যাদের মাঝে আমি শিক্ষা জীবনের দীর্ঘ দশটি বছর
কাটিয়ে এখন সমাপণের দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

-মহিউদ্দিন আহমদ

অনুবাদকের কথা

বক্ষমান পুস্তিকাটি বর্তমান বিশ্বের সর্বজনমান্য ও প্রাত্যয়িক আলেমে দ্বীন শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দামাতবারাকাতুহুম-এর একটি আলোচনা। দাওরায়ে হাদীসের তালিবে ইলমের উদ্দেশ্যে তিনি তিরমিযী শরীফের দরসে 'কিতাবুস্ সিয়ার'-এর ভূমিকা স্বরূপ এ আলোচনা পেশ করেন। আলোচনায় তিনি আধুনিকমনা ও প্রগতিবাদী ওলামায়ে কেরাম ও তাবলীগী ভাইদের দ্বীনী বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। যেগুলো সার্বজনীন ধর্ম ইসলামের জন্য খুবই বিপদজনক। এছাড়া তিনি ভ্রান্ত বিষয়গুলোর সংশোধনের দায়িত্ব কাদের উপর সে ব্যাপারেও আলোচনা করেছেন।

আলোচনাটি তালিবে ইলমের উদ্দেশ্যে করা হলেও যেহেতু তা সচেতন দ্বীনদার মুসলমান ও ওলামায়ে কেরামের জানা প্রয়োজন। সে জন্য আলোচনাটিকে অনুবাদ করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। যেন এর মাধ্যমে আমাদের সংশোধন হওয়া এবং করার সুবোধ উদয় হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা এ পুস্তিকার লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সহযোগী সকলকে নিজ শান অনুযায়ী জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

মহিউদ্দিন আহমদ

২৩-০২-২০১১ ঈ. পারুয়ারা (উত্তর পাড়া), বুড়িচং, কুমিল্লা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

জিহাদের শাব্দিক অর্থ হল কষ্ট, চেষ্টা। আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের জন্য যে কোন প্রকার কষ্ট-প্রচেষ্টা করাকে শাব্দিকভাবে জিহাদ বলা হয়। কিন্তু পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় এমন আমলকে যাতে শত্রু বা কাফিরের মুকাবিলায় যুদ্ধ করা হয়। চাই তা আত্মরক্ষামূলক হোক বা আক্রমণাত্মক হোক। উভয়ই জিহাদের পারিভাষিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। উভয়ই ইসলামী শরীয়ত অনুমোদিত।

খ্রিষ্টানদের শোচনীয় পরাজয়

আপনারা অবশ্যই জানেন, দীর্ঘকাল ধরে খ্রিষ্টানজগত মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আসছে। ইসলাম যখন আরবের সীমানা পেড়িয়ে সামনে অগ্রসর হল। সর্বপ্রথম রোম সম্রাটের সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা হয়। সে সময় মুসলমানদের হাতে রোম সাম্রাজ্যের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। ফলে খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয় মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে ক্রুসেড তথা ধর্মযুদ্ধ। অবশেষে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ. (মৃ. ৫৮১ হিজরী) নুরুদ্দীন জঙ্গী রহ. (মৃ. ৫৬৪ হিজরী) ও ইমাদুদ্দীন জঙ্গী রহ. (মৃ. ৫৪১ হিজরী) খ্রিষ্টানদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

ক্রুসেডের পরিচয়

আমাদের নিকট জিহাদ একটি ইবাদত। জিহাদে অংশগ্রহণ করা, তাতে শহীদ হওয়া সম্পর্কে কোরআন হাদীসে পুণ্য ও ছাওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এ উত্তম প্রতিদান ও পুণ্য অর্জনের জন্যই মুসলমানগণ কাফেরদের মুকাবিলায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানদের নিকট জিহাদ কোন ইবাদত ছিল না, বরং তাদের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিলের শিক্ষা হল, যদি কেউ তোমার এক গালে চড় মারে, তাহলে তুমি তার সামনে তোমার অপর গাল এগিয়ে দাও। এজন্যে খ্রিষ্টধর্মে জিহাদ বা যুদ্ধের

কল্পনাই করা হত না। কিন্তু যখন মুসলমানদের মুকাবিলার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তারা ক্রুসেড, ধর্মযুদ্ধ ও পবিত্র যুদ্ধের নামে কিছু পরিভাষা তৈরী করে নিল। তাদের ধর্মগুরু পোপ খ্রিষ্টান জগতে ঘোষণা করল, এ যাবত আমরা তো একথা বলে আসছিলাম যদি কেউ তোমার এক গালে চড় মারে, তাহলে তুমি তার সামনে তোমার অপর গাল এগিয়ে দাও। কিন্তু এখন মুসলমানদের মুকাবিলায় আমরা যে যুদ্ধ করব, তা আমাদের ধর্মীয় যুদ্ধ ও পবিত্র যুদ্ধ। পাশাপাশি এ ঘোষণাও দিল, যে ব্যক্তি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে সে সম্মানিত। যে যুদ্ধের জন্য চাঁদা দেবে, চাঁদা বাক্সে পড়ার পূর্বেই সে জান্নাতী হয়ে যাবে। এ জাতীয় ঘোষণার ভিত্তিতেই শুরু হয় ক্রুসেড। দীর্ঘকাল খ্রিষ্টানরা এ যুদ্ধ অব্যহত রাখে। হামলার পর হামলা চালাতে থাকে। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে সফলতার মুখ দেখা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। বরং প্রতিনিয়ত তাদের পরাজয়ই বরণ করতে হয়েছে।

বায়জীদ ইয়ালদারসের আশ্চর্য ঘটনা

ক্রুসেড চলাকালীন সময়কার কথা। বায়জীদ ইয়ালদারস্ নামে তুর্কী এক বাদশাহ ছিলেন। তুর্কী ভাষায় বজ্র-বিজলীকে 'ইয়ালদারস' বলা হয়। বাস্তবেও তিনি দুশমনের জন্য বজ্রের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না।

একবার ইউরোপের ৬০টি সাম্রাজ্য সম্মিলিতভাবে তাঁর উপর আক্রমণ করল। ঐ যুদ্ধে প্রত্যেক রাজ্যের রাজাগণ নিজ রাজপুত্রদেরকে প্রেরণ করে। অর্থাৎ ইউরোপের ৬০টি রাজ্যের রাজপুত্রগণ নিজ নিজ সৈন্য বাহিনী নিয়ে বায়জীদের উপর আক্রমণ করে। যুদ্ধে বায়জীদ ইউরোপিয়ানদের শুধু পরাজিতই করেননি বরং তিনি ৬০জন রাজপুত্রকেও বন্দি করেন। তবে তিনি তাদেরকে খুবই সম্মানের সাথে তাবুতে রাখেন।

কিছুদিন পর তাদেরকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বল তোমাদের সাথে আমি কিরূপ আচরণ করব? তারা বলল, আপনার হাতে আমরা বন্দী, তাছাড়া আপনি বিজয়ী, আমরা পরাজিত। তাই আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। ইচ্ছা করলে হত্যাও করতে পারেন, ইচ্ছা করলে গোলামও বানাতে পারেন। বায়জীদ বললেন, আমি তোমাদেরকে এক শর্তে ছাড়তে পারি। শর্ত হল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে

গিয়ে পূর্ণ এক বছর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে। পরবর্তী বছর সকলে একসাথে আমার উপর আক্রমণ করবে। যদি তোমরা এ শর্তে একমত হও, তবে তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, অন্যথায় নয়।

বায়জীদ ইয়ালদারসের ইন্তেকাল

তিনি এমন এক মর্দে মুজাহিদ ছিলেন যে, ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের আমরণ দূর্বল করে রেখেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন এবং প্রায় বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তৈমুরলং পেছন থেকে আক্রমণ করলে তিনি অবরোধ তুলে নেন। তৈমুরলং তাকে পরাজিত করেন। লোহার খাঁচায় বন্দী করে তাঁকে নিয়ে যান। এ অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়।

মুসলমান রণক্ষেত্রে কখনো পরাজিত হয়নি

এ ক্রুসেডে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের হাতে বড় ধরণের মার খায় এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে মুসলমানদের সাথে তাদের চরম শক্রতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে ক্রুসেড যখন তাদের জন্য সফলতা বয়ে আনতে পারল না, তখন তারা ধোঁকা, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী সাম্রাজ্যের উপর হস্ত প্রসারিত করল। যখন তারা দেখল সম্মুখ সমরে মুসলমানদের পরাজিত করা সম্ভব নয়, তখন বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে মুসলমানদের পরাজিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হল। এমনকি মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে তাদের অশুভ চিন্তা-চেতনাকে প্রবেশ করিয়ে দিল।

ইসলামের প্রচার-প্রসার কি তরবারির জোরে হয়েছে

এক পর্যায়ে তারা মিথ্যা-প্রচারণা শুরু করল যে, মুসলমানদের জিহাদের উদ্দেশ্য হল জনগণকে জোরপূর্বক তরবারির ভয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা- হয় তোমরা মুসলমান হও, নতুবা তোমাদের হত্যা করা হবে। জিহাদ মূলত ইসলাম প্রচারের একটি অবৈধ পন্থা।

কথাগুলোকে তারা এভাবে ব্যক্ত করতে লাগল, 'ইসলাম তরবারির জোরে প্রচার হয়েছে' তাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে জনগণ মুসলমান হয়নি। খুব

জোরেশোরে তারা এ অপপ্রচার শুরু করল। অথচ তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। স্বয়ং কুরআনের ভাষ্য-

لا اكراه فى الدين

অর্থ : দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নাই[১]।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

অর্থ : যার ইচ্ছা মু'মিন হও, যার ইচ্ছা কাফির হও[২]।

দ্বিতীয়ত, বাধ্য করে মুসলমান বানানোই যদি জিহাদের উদ্দেশ্য হত, তবে কেন জিজিয়া বা কর আদায় করা ও হত্যা না করে অধিনস্ত বানিয়ে পাশাপাশি বসবাস করার রীতিনীতি? কেনই বা প্রথমে এ আহ্বান, 'যদি তোমরা মুসলমান না হও, তাহলে কর আদায় কর। তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে না।' সুতরাং জিজিয়া বা কর আদায় করার নীতিই প্রমাণ করে 'বাধ্য করে মুসলমান বানানো' জিহাদের উদ্দেশ্য নয়।

ইসলামের ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ নেই যে, বিজিত এলাকায় মুসলমানগণ কাউকে বাধ্য করে মুসলমান বানিয়েছে। বরং ইসলাম প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিয়েছে। অবশ্য মুসলমানগণ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে। যে মুসলমান হয়েছে, দাওয়াতের কারণেই হয়েছে। আর যে হয়নি, তাকেও একজন মুসলমানের মতই ন্যায্য অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কাজেই তরবারির জোরে ইসলাম প্রচার হয়েছে বা বাধ্য করে মুসলমান বানানোই জিহাদের উদ্দেশ্য, একথা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন।

জিহাদের উদ্দেশ্য

এখন প্রশ্ন হয় তাহলে জিহাদের উদ্দেশ্যটা কি? খুব ভালভাবে বুঝে নিন! কুফরী শক্তির প্রভাবকে চুরমার করে তাদের দাপট ও দৌরাত্মা দমন করা এবং ইসলামী শক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা; এক কথায় আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করাই হল জিহাদের মূল উদ্দেশ্য।

---

১. সূরা বাকার, আয়াত-২৫৬। ২. সূরা কাহাফ, আয়াত-২৯

যার সরল ব্যাখ্যা হল, যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ না কর, ঠিক আছে এতে কোন সমস্যা নেই- এটা তোমাদের বিষয় আর তোমাদের আল্লাহর বিষয়। পরকালে তোমাদেরই শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ বিষয়টা আমরা মেনে নিতে পারি। কিন্তু তোমরা তোমাদের কুফরী ও শোষণমূলক শাসন ব্যবস্থা আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করবে, আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের গোলাম বানাবে, তাদেরকে অত্যাচার ও নিপীড়ন করবে, যার মাধ্যমে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হবে, এসবের অনুমতি তোমাদের দিতে পারি না। সুতরাং তোমরা হয়ত ইসলাম গ্রহণ কর। (তাহলে তো ভালই) আর যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তাহলে তোমাদের ধর্মেই থাক, কিন্তু আমাদের বশ্যতা মেনে জিযিয়া বা কর আদায় কর।

'জিযিয়া আদায় কর' এর অর্থ হল, আমাদের শাসন ব্যবস্থা মেনে নাও। কারণ তোমাদের শাসন ব্যবস্থা মানুষকে মানুষের গোলাম বানায়। আমরা মানুষকে মানুষের গোলাম না বানিয়ে আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর গোলাম বানাই। এক কথায় আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করি। আর এটাই হল জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

তোপ কামান কী করল

একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন আকবার ইলাহাবাদী। তিনি পশ্চিমাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমালোচনার জবাবে চমৎকার কবিতা লিখতেন। পশ্চিমারা যখন অভিযোগ তুলল, 'ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচার হয়েছে' তিনি এর জবাবে নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় রচনা করেছিলেন ঃ

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے ☆ غلط الزام بھی اوروں پر لگا رکھا ہے
یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام ☆ یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے؟

নিজেদের দোষক্রটির অনুভূতি তোমাদের কোথায়? অথচ ভ্রান্ত অভিযোগ অন্যদের ঘারে চাপিয়ে দিয়েছ। আর এ কথাই বলে বেড়াচ্ছ তলোয়ারের জোরে ইসলামের প্রচার হয়েছে। একথা কেন বল না, তোপ কামান দ্বারা কী প্রচার হয়েছে।

অর্থাৎ তোমরা তো অভিযোগ করছ, 'তরবারির শক্তিতে ইসলামের প্রচার হয়েছে।' কিন্তু তোমাদের তোপ কামান বিশ্বে কী প্রচার করছে, সে কথা

বলছ না কেন? অথচ তোমরা তো কামান দাগিয়ে পুরো বিশ্বে চরিত্রহীনতা, বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনা ছড়িয়েছ। যদি মেনেও নেই তরবারির শক্তিতে ইসলাম প্রচার হয়েছে, তাহলে এর দ্বারা তো উত্তম চরিত্র, খোদাভীরুতা ও পবিত্রতাই প্রচার হয়েছে। আর তোমরা ছড়িয়েছ নির্লজ্জতা ও উলঙ্গপনা।

প্রগতিবাদীদের মতে জিহাদ শুধু আত্মরক্ষামূলক

ইংরেজ শাসনামল থেকে আমাদের মধ্যে একটি দল বিদ্যমান। পশ্চিমা বিশ্ব যখনই ইসলাম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাঁড় করে, তখনই তারা তাদের সামনে হাত জোড় করে বলে, হুজুর! আপনারা ভুল বুঝছেন। আসলে আমাদের ধর্মে এমন কোন কথা নেই এবং তারা এ বিষয়ে 'ক্ষমা প্রার্থনা'র পন্থা গ্রহণ করে।

যখন পশ্চিমারা এ অপপ্রচার শুরু করল যে, 'তরবারির মাধ্যমে ইসলামের প্রচার হয়েছে' তখন উত্তরে তারা বলতে লাগল, ইসলাম যে জিহাদের অনুমতি দেয় তা শুধু আত্মরক্ষার জন্য। অর্থাৎ শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ করলে তখনই কেবল আত্মরক্ষার নিমিত্তে আমরা জিহাদ করি। এছাড়া শুরুতে কারো উপর আক্রমণ করার জিহাদ ইসলাম অনুমোদিত নয়। উদ্দেশ্য হল, যদি কেউ আমাদের উপর আক্রমণ করে তাহলেই আমরা এর উত্তর দেব। কিন্তু যদি অন্য কেউ আমাদের উপর আক্রমণ না করে, তাহলে তাদের উপর আক্রমণ করা বা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আমরা বৈধ মনে করি না। মোটকথা, আত্মরক্ষামূলক জিহাদ বৈধ, আক্রমণাত্মক জিহাদ বৈধ নয়। শরীয়ত অনুমোদিত নয়।

এমনকি তারা তাদের এ মতকে অটুট রাখার জন্য কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর দলিলও পেশ করতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير

অর্থ ঃ তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম[১]।

---

[১] সূরা হজ্ব, আয়াত-৩৯

দেখুন এখানে বলা হয়েছে, যাদের সাথে অন্য কেউ যুদ্ধ করে, যাদের উপর অত্যাচার করে তাদের জন্য যুদ্ধ বা জিহাদের অনুমতি আছে। এছাড়া অন্য কারো জন্য জিহাদের অনুমতি নেই। এভাবে তারা আরো প্রমাণ পেশ করে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم

অর্থ, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে[১]।

এ আয়াতে প্রথমে আক্রমণ করা এবং আক্রমণাত্মক জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়নি। এসকল আয়াতের ভিত্তিতে তারা বলে জিহাদ মূলত আত্মরক্ষার জন্যই অনুমোদিত হয়েছে। যখন মুশরিকরা তোমাদের উপর আক্রমণ করে অথবা অত্যাচার করে, তখন তাদের প্রতিরোধে তোমরা জিহাদ করবে। কিন্তু যদি তারা তোমাদের উপর আক্রমণ না করে, তোমাদের উপর অত্যাচার না করে তাহলে তোমাদের জন্য জিহাদের অনুমতি নেই।

জিহাদের বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে

'আত্মরক্ষামূলক জিহাদই শরীয়ত অনুমোদিত, আক্রমণাত্মক জিহাদ শরীয়ত অনুমোদিত নয়' এটা এমন একটি কথা যা চৌদ্দশত বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত কোন ফুকাহায়ে উম্মত গ্রহণ করেননি। মূলত কথা হল, জিহাদের বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কী জীবনে তরবারি উঠাতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। তখন নির্দেশ ছিল, ধৈর্য্য ধরুন। আরো নির্দেশ ছিল, যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে কষ্ট দেয় তাহলে তার উত্তরে কোন প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না। তাছাড়া মক্কী জীবনে কোন প্রকার জিহাদের অনুমতি ছিল না।

---

১. সূরা বাকার, আয়াত-১৯০

পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু জিহাদ ফরয করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير

অর্থ ঃ তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম[১]।

এ আয়াতে জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ শর্ত সাপেক্ষ যে, যদি তোমাদের উপর কেউ অত্যাচার করে অথবা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবেই তাদের প্রতিরোধে জিহাদের অনুমতি আছে।

আক্রমণাত্মক জিহাদ বৈধ

অতঃপর তৃতীয় পর্যায়ে আত্মরক্ষামূলক জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হল ঃ قاتلون فى سبيل الله الذين يقاتلونكم

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে জিহাদ কর, যারা তোমদের উপর আক্রমণ করে[২]। চতুর্থ পর্যায়ে আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

كتب عليكم القتال وهو كره لكم

অর্থ ঃ তোমাদের উপর সশস্ত্র জিহাদ ফরয করা হয়েছে। যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়[৩]।

এ আয়াতের মাধ্যমে আদেশ দেয়া হল যে, আক্রমণাত্মক জিহাদও ফরয । জিহাদ শুধু আত্মরক্ষার অর্থে সীমিত নয়। এরপর সূরায়ে তাওবার ৫নং আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

অর্থ ঃ অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে, মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে। তাদেরকে বন্দী করবে। অবরোধ করবে এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে।

---

১. সূরা হজ্ব, আয়াত-৩৯। ২. সূরা বাকারা, আয়াত-১৯০, ৩. সূরা বাকারা, আয়াত-২১৬

সে সময় হযরত আলী রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করলেন, যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে, তাদেরকে সে পরিমাণ অবকাশ দেয়া হল। আর যাদের সাথে কোন প্রকার চুক্তি নেই, তাদেরকে চার মাসের সুযোগ দেয়া হল। এ সময়ের মধ্যে তারা আরবভূমি ত্যাগ করবে। নতুবা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করা হল।

মোটকথা, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আক্রমণাত্মক জিহাদও বৈধ করা হল। এখন কেউ যদি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় অবতীর্ণ আয়াতের উপর ভিত্তি করে বলে, জিহাদ শরীয়ত অনুমোদিত নয়। মুসলমানদেরকে ধৈর্য্য ধারণের হুকুম দেয়া হয়েছে। মুশরিকরা যদি তোমাদেরকে কষ্ট দেয়, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, তাহলে তো একথা সুস্পষ্ট যে, তাদের এ মতামত সম্পূর্ণ ভুল। ঠিক তেমনি কেউ যদি আত্মরক্ষামূলক জিহাদের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ আয়াতের উপর ভিত্তি করে বলে, মুসলমানদের জন্য আত্মরক্ষাই বৈধ। আক্রমণাত্মক জিহাদ বৈধ নয়। তাদের একথাও সম্পূর্ণ ভূল। মূলকথা হল, ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ বৈধ। এবং শরীয়ত অনুমোদিত।

দ্বীনদার শ্রেণীর আরো একটি ভুল ধারণা এবং তার উত্তর

এতো ছিল প্রগতিবাদীদের ভ্রান্ত দাবীর বিশদ উত্তর। অর্থাৎ পশ্চিমাদের ভয়ে ভীত হয়ে যারা মনে করে, 'শুধু আত্মরক্ষার জিহাদ বৈধ। আক্রমণাত্মক জিহাদ শরীয়ত অনুমোদিত নয়'। এছাড়া দ্বীনদার শ্রেণীর লোকদেরও একটি ভুল ধারণা আছে। আর এখন দিনে দিনে সেই ভুল ধারণা প্রসার লাভ করছে। আমাদের তাবলীগ জামাতের 'মুরুব্বীগণ' এ ভুল ধারণার শিকার হচ্ছেন। তাই এ বিষয়টা একটু আলোকপাত করতে চাই।

সে ভ্রান্ত ধারণা হল, জিহাদ শুধু ঐ সময় এবং ঐ জাতির সাথে ফরয, যখন কোন জাতি দাওয়াতের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয় যেন দাওয়াতই মূল উদ্দেশ্য। যদি কোন দেশ বা জাতি এর পথে কোন প্রকার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় অথবা নিজ দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি না দেয় তখনই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয। কিন্তু যদি কোন দেশ বা রাষ্ট্র দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে। আর বলে, আসুন! আপনারা আমাদের এখানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করুন। তবে তাদের সাথে

জিহাদ ফরয নয় এ কথাগুলো প্রথমে প্রগতিবাদীরাই বলত। এখন দ্বীনদার শ্রেণীর লোকেরাও এমনকি তাবলীগ জামাতের 'মুরুব্বীরা'ও বলতে শুরু করেছেন। প্রথমে তো শুধু মুখে মুখে বলতেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের লেখাও আমি দেখেছি। এরপরই একথাগুলো বলছি। আসলে জিহাদের বাস্তবতা না বুঝার কারণেই তারা এ ধরণের কথা বলছেন।

বস্তুত, শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি দেয়ার কারণে কোন অমুসলিম দেশের সাথে জিহাদ করা যাবে না। একথা বড়ই বিপদজনক। কেননা, শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি দেয়ার মাধ্যমে জিহাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। বরং জিহাদের উদ্দেশ্য হল, কুফরী শক্তির প্রভাবকে চুরমার করে তাদের দাপট ও দৌরাত্মাকে দমন করা এবং ইসলামী শক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা- এক কথায় আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করা। আর যতদিন কুফরী শক্তি টিকে থাকবে, ততদিন শাশ্বত দ্বীন গ্রহণে মানুষের মন ও মানসিকতা বিকশিত হবে না। কেননা নীতিই হল, যখন কোন জাতির রাজনৈতিক শক্তি এবং তাদের কর্তৃত্ব মানুষের মন ও মননে ছেয়ে যায়, তখনই জনসাধারণ সে জাতির কথা খুব সহজে বুঝে। এর বিপরীত কথা সহজে তাদের অন্তরে স্থান পায় না। অভিজ্ঞতা এমনই বলে।

পশ্চিমাদের সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাগুলো জনসাধারণ শুধু শুনছে এমন নয় বরং নির্দ্বিধায় মেনেও নিচ্ছে। তাদের কথা মত কাজও করছে। কেন? এজন্য যে, আজ পুরো পৃথিবীতে তাদের মুদ্রা চলে। তাদের কৃর্তৃত্ব চলে। তাদের চিন্তা-চেতনাই পৃথিবীময় প্রতিফলিত। এমতাবস্থায় যদি কোন পশ্চিমা দেশ দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে এবং নিজ দেশের ভিসা দেয়। এর দ্বারা জিহাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। যত দিন না তাদের শক্তি ও দাপট চুরমার হবে। তাদের কর্তৃত্ব ধ্বংস হবে। মানুষের মন ও মেধা থেকে তাদের ভয় দূর হবে। আর তাদের এ দাপট, প্রভাব, কর্তৃত্ব ও ত্রাস তাদের মোকাবেলা করা ছড়া ধ্বংস হবে না। সুতরাং কোন দেশ দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি প্রদান করলে জিহাদের আর কোন প্রয়োজন নেই, একথা বলা নিছক ধোকা ছাড়া কিছুই নয়।

জিহাদকে অস্বীকারকারী কাফির

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি কোন ব্যক্তি বা জামাত আক্রমণাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করে অথচ তা শরীয়তের মূলনীতির মাধ্যমে প্রমাণিত। আর শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদের কথা বলে। ইসলামী শরীয়তে সে জামাতের অবস্থান কী? তাদেরকে কি কাফের বা পথভ্রষ্ট বলা হবে?

একথা আমি পূর্বেই বলে দিয়েছি যে, তাদের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু যারা এ ধ্যান ধারণার প্রবক্তা তাদেরকে কাফির বলাও তেমন সহজ বিষয় নয়। কেননা, কাউকে কাফির আখ্যা দেয়া এমনই এক স্পর্শকাতর বিষয় যাতে শতভাগ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। তবে যারা সাধারণভাবে জিহাদকে অস্বীকার করে তাদেরকে নিঃসন্দেহে কাফির বলা যাবে। যেহেতু জিহাদ দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বা দল শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদের প্রবক্তা, আক্রমণাত্মক জিহাদের অস্বীকারকারী তাদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় 'মুআব্‌বিল' (ভিন্ন ব্যাখ্যাকারী) বলা হয়। মুআব্‌বিলকে কাফির বলা যায় না। এজন্যে তাদেরকেও কাফির বলা হবে না।

অবশ্য তাদের ধ্যান ধারণা সুস্পষ্টভাবে ভ্রান্ত। এটা শুধু গবেষণামূলক বিরোধ নয়। বরং সত্য ও মিথ্যার মাঝে বিরোধ। আক্রমণাত্মক জিহাদ অস্বীকারকারীদেরকে বলা হবে, তারা ভ্রান্ত, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেয়া যাবে না।

'হানাহানির ধর্ম ইসলাম' এ অভিযোগ কেন?

জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন, পশ্চিমারা জিহাদের প্রসঙ্গে ইসলামের উপর বড় ধরণের এক অপবাদ ছড়িয়েছে যে, 'ইসলাম হানাহানি ও মারামারির ধর্ম।' এ অভিযোগ ও অপবাদ তখনই আরোপ করা যেত, যদি ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বজগতকে আলোড়িত করে ফেলত। আর তখনই বাস্তবে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারত যে, মুসলমানদের এ বিজয় অভিযান সম্ভবত তাদের আততায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার ফলাফল। কিন্তু আজ যখন মুসলমান সর্বদিকেই পরাজিত ও নিশ্চিত পতনের মুখে তখন তাদের এ অভিযোগ অপপ্রচার বৈ কিছুই নয়।

আসলে কথা হল, এখন যদিও মুসলমানররা দূর্বল, তবে ইতিহাস সাক্ষী আল্লাহ তায়ালা যখনই তাদেরকে একটু মাথা উঁচু করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাদের মাঝে একতা ফিরে এসেছে। মুসলমানরা তখনই শত্রুদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে এবং তাদের সকল নীলনকশা ও অপকৌশলকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর পরাশক্তি যদিও মুসলমানদেরকে দূর্বল দেখছে। তবে তারা ভীতসন্ত্রস্ত যে, যদি ঘুমন্ত সিংহের ঘুম ভাঙ্গে তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। পশ্চিমা শক্তি যদিও এখন মুসলমানদেরকে দমিয়ে রেখেছে। কিন্তু তাদের এ দমিয়ে রাখার উদাহরণ হল, যেমন একটি কৌতুক আছে। একজন দূর্বল ব্যক্তি জাদুমন্ত্রের মাধ্যমে এক বাহাদুরকে ধরাশায়ী করে বুকে চেপে বসল। বসেই কান্না জুড়ে দিল। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাঁদছো কেন? লোকটি বলল, সে উঠে এখন আমাকে মারবে। এ কথা ভেবেই আমি কাঁদছি। হুবহু এ অবস্থা পশ্চিমাদেরও। সম্মুখ সমরে তো মুসলমানদেরকে ধরাশায়ী করতে পারবে না। তবে তারা বিভিন্ন অপকৌশলের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে এ পরিমাণ দমিয়ে রেখেছে যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। জন্ম নিয়েছে নানা দ্বন্ধ-সংঘাতের। তারা আপ্রাণ চেষ্টায় আছে, যেন মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হতে না। পারে তথাপিও এ ভেবে তাদের চোখে ঘুম নেই যে, যদি মুসলমানগণ তাদের চেতন ফিরে পায় এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। তবে আমাদের পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ।

জিহাদের জন্য তিনটি শর্ত

এক তালিবে ইলম প্রশ্ন করেছেন, নবুওয়াতের প্রথম তের বছর পারিভাষিক অর্থে জিহাদ ছিল না। ধৈর্য্য ও সাধনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের আমল যখন পরিচ্ছন্ন হল। পরবর্তীতে মদিনার জীবনে জিহাদ ও সশস্ত্র যুদ্ধের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। প্রশ্ন আসে বর্তমান সময়ে যেহেতু মুসলমানগণ আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে ঐ স্তরে পৌঁছুতে পারেনি এজন্যে এ অবস্থায় জিহাদের পূর্বে আত্মশুদ্ধির প্রতি বেশী মনোযোগী হওয়া উচিত নয় কি?

এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন। আসলে কথা হল, আক্রমণাত্মক জিহাদ মৌলিকভাবেই শরীয়ত অনুমোদিত। তবে এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো না পাওয়া

পর্যন্ত জিহাদ শুধু নিষেধই নয় বরং ক্ষতিকরও বটে। সে শর্তগুলোর মধ্যে এটাও একটা যে, জিহাদ 'ফি সাবিলিল্লাহ' হতে হবে। 'ফি সাবিলিন্নফছ' হতে পারবে না। অর্থাৎ জিহাদরে উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। যদি কেউ এ জন্যে জিহাদ করে যে, আমার নাম প্রসিদ্ধ হবে। আমাকে মানুষ মুজাহিদ ও বাহাদুর বলবে। মানুষ আমার প্রশংসা করবে। দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, এটা 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' নয়। বরং এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বার্থ। কাজেই জিহাদের অনিবার্য শর্ত হল নিজের আত্মশুদ্ধি করা। আর আত্মশুদ্ধির পরই 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' হবে।

শরয়ী জিহাদের আরেকটি শর্ত হল, জিহাদের জন্য একজন আমীর (নেতা) থাকা । যার নেতৃত্বে সকলেই একমত। যদি ঐক্যমতের ভিত্তিতে আমীর নির্ধারিত না থাকে তাহলে যুদ্ধ শেষে পরস্পরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। যেমন এখন আফগাস্তিানে চলছে[১]। আর আমীর না থাকলে জিহাদের ফলাফল অর্জিত হয় না। তাই জিহাদের জন্য ঐক্যমত ভিত্তিক একজন আমীর অত্যাবশ্যক।

জিহাদের আরেকটি শর্ত হল, জিহাদের জন্য শক্তি অর্জিত হওয়া। কারণ শক্তি ব্যতিত জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া নিজের মাথায় নিজে আঘাত করার মত। এ জন্য শক্তি অর্জন ব্যতিত জিহাদ বৈধ নয়। সুতরাং এ তিনটি শর্ত অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এটাই জিহাদ যে, এ তিনটি শর্ত অর্জনের চেষ্টা করতে থাকবে। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি, আমির নির্বাচন ও শক্তি অর্জন করতে থাকবে। আর যখনই এ শর্তগুলো পাওয়া যাবে তখনই জিহাদ শুরু করতে হবে।

জিহাদের ব্যাপারে তাবলীগ জামাতের দৃষ্টিভঙ্গি

এক তালিবে ইলম প্রশ্ন করেছেন, তাবলীগ জামাতের কোন কিতাব বা লেখনীর দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, তারা জিহাদ ফরয হওয়াকে অস্বীকার করেন? আর ওলামা য়েকেরাম কি তাবলীগ জামাতের ওলামা ও মুরুব্বীদেরকে বিষয়টি অবহিত করেননি?

---

১. এটা ১৪০০ হিজরীর পূর্বের সময়কার কথা। -অনুবাদক

আসলে কথা হল, অনেকেই তাবলীগ জামাতের ব্যাপারে আমার নিকট অনেক কথাই বলেন। যেমন, তাবলীগ জামাতের অমুক 'মুরুব্বী' তার বয়ানে এমন এমন আলোচনা করেছেন। এমনকি এ আলোচনাও করেছেন যে, বর্তমানে যেখানে যেখানে জিহাদ চলছে, কাশ্মীর-বসনিয়া যেখানেই হোক, এ জিহাদ শরীয়ত সম্মত নয়। মূল বিষয় হল 'দাওয়াত'। এ ধরণের বিভিন্ন কথাই অনেক ভাই আমার কাছে বলেন। কিন্তু যেহেতু বর্ণনা এবং বুঝার ক্ষেত্রেও ভুল হতে পারে এ জন্যে নিজ কানে শ্রবণ না করা পর্যন্ত তাবলীগ জামাতের কোন মুরুব্বীর প্রতি এ সকল কথার সম্মন্ধ করি না তবে তাবলীগের মুরুব্বীদের সাথে কখনো সাক্ষাত হলে অবশ্যই এ ব্যাপারে অবহিত করি যে, এমন এমন কথা শুনা যাচ্ছে। আপানারা বিষয়টি একটু যাচাই করবেন। যদি বাস্তবেই কথা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত।

কিন্তু তাবলীগ জামাতের একজন প্রভাবশালী মুরুব্বীর একটি চিঠি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। যাকে আমি খুবই সম্মান করি। তিনি তাবলীগ জামাতের এক সাথীর কাছে এ চিঠিখানা লিখে ছিলেন। ঐ সাথী চিঠিখানা আমার নিকট পাঠিয়েদেন। চিঠির লেখার পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হল, বর্তমান সময়ে জিহাদের প্রতি মনোনিবেশ করা, জিহাদের ব্যাপারে ফিকির করা এবং জিহাদের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। কারণ, জিহাদ মূলত দাওয়াতেরই জন্য। যদি দাওয়াত ও তাবলীগের স্বাধীনতা পাওয়া যায় তাহলে এমন নয় যে জিহাদ জরুরী নয় বরং তা ক্ষতিকরও বটে। আরো লিখা ছিল, এখনও একথাগুলো মানুষের বুঝে আসছে না। ধীরে ধীরে আলেম সমাজেরও কথাগুলো বুঝে আসবে।

এ চিঠি দ্বারা বুঝে আসে তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীদের ব্যাপারে যে সকল কথা শোনা যাচ্ছে তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এ ধরনের চিন্তাধারা আস্তে আস্তে সৃষ্টি হচ্ছে। একথাগুলো এমন যার ব্যাপারে চুপ করে থাকার কোন অবকাশ নেই। এজন্য আমরা তাবলীগের মুরুব্বীদের সাথে মৌখিক আলোচনাও করেছি, যাদের সাথে আমাদের সু-সম্পর্ক রয়েছে এবং বড়দের নিকট একথা পৌঁছে দেয়ার গুরুত্বারোপও করা হয়েছে যে, এ

সকল কথা-বার্তা যা উদ্ভব হচ্ছে তা বড়ই বিপদজনক। উক্ত চিঠিখানা আমার নিকট এখনো সংরক্ষিত আছে। কারো পড়ার ইচ্ছা হলে, এসে পড়ে নিতে পারেন।

তাবলীগ জামাত দ্বীনের এক বড় খিদমত

আলহামদুলিল্লাহ! উপরোক্ত কথাগুলো সংশোধনের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগ এমন একটি জামাত যার কার্যক্রম দেখে আলহামদুলিল্লাহ অন্তর খুশিতে ভরে উঠে। তারা দ্বীনের এমন এক উঁচু কাজ করছেন যা অন্য কেউ করতে পারেনি। এ জামাতের উছিলায় আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের কালিমাকে আজ কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. (মৃ. ১৩৬৩ হিজরী) আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করুন। তার ইখলাস ও ঈমানী জযবার কারণে আজো এ জামাতকে আল্লাহ্ তা'আলা টিকিয়ে রেখেছেন এবং এ জামাতের আহ্বান ও দাওয়াতকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার দিকবিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রয়োজন সহযোগিতা ও সতর্কীকরণের

সর্বদা একথা স্মরণ রাখতে হবে, কোন জামাত বা দলের প্রসার লাভ এবং তার দাওয়াত পৃথিবীর দিক দিগন্তে ছড়িয়ে যাওয়া যদি সঠিক পদ্ধতিতে হয় তাহলে তা অবশ্যই প্রশংসারযোগ্য। এমতাবস্থায় তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কোন অশুভ বিষয়াদি প্রকাশ পায় অথবা কোন ভুল চিন্তাধারার সৃষ্টি হয় তাহলে সহযোগিতার পাশাপাশি সে সকল ভুল ভ্রান্তির ব্যাপারে সতর্ক করাও আবশ্যক। যেন এমন না হয়, একটি উত্তম জামাত যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের এত বড় খিদমত নিচ্ছেন। তা কোন ভুল পথে চলে যায়। বিশেষভাবে সতর্ক করা তখনই বেশী প্রয়োজন যখন এর জিম্মাদার কোন বিজ্ঞ আহলে ইলম না হন। বরং অধিকাংশই সাধারণ মুসলমান। যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী নন। আর যে সকল আলেম তাদের সাথে সম্পৃক্ত আছেন তাদের ব্যস্ততাও কিন্তু ইলম নয়। কারণ আলেম সমাজ দু শ্রেণীতে বিভক্ত। কিছু ওলামায়ে

কেরাম এমন যারা দরস-তাদরীস ও ফতোয়া প্রদানে ব্যস্ত থাকেন। এ শ্রেণীর ওলামায়ে কেরাম ইলমের সাথে সম্পৃক্ত। আর কিছু ওলামায়ে কেরাম যাদের দরস-তাদরীস ও ফতোয়া প্রদানের কোন ব্যস্ততা নেই। আলহামদুলিল্লাহ এ শ্রেণীর ওলামায়ে কেরামের নিকট ইলম তো অবশ্যই আছে। কিন্তু এর ঘষামাজা না থাকার কারণে তাদের অন্তরে ভুল চিন্তাধারার সৃষ্টিও হতে পারে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. এর একটি ঘটনা

আমি আপনাদেরকে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ. এর একটি ঘটনা শুনাব। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে যান। আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. (মৃ. ১৩৯৬ হিজরী) কোন কাজে দেওবন্দ থেকে দিল্লী গিয়েছিলেন। দিল্লীতে তিনি সংবাদ পেলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ. অসুস্থ। তাঁকে দেখার জন্য তিনি নিজামুদ্দীনে চলে গেলেন। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন ডাক্তার তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে নিষেধ করেছেন। আব্বাজান সেখানের উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আমিতো হযরতকে দেখার উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। জানতে পারলাম ডাক্তারগণ দেখা করতে নিষেধ করেছেন। তাই দেখা করা জরুরী মনে করছি না। হযরত সুস্থ হলে আমার আগমনের সংবাদ দিবেন এবং আমার সালাম জানাবেন। একথা বলে আব্বাজান ফিরে আসলেন।

কেউ ভেতরে গিয়ে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ.-কে বললেন, হযরত মুফতী শফী সাহেব রহ. এসেছিলেন। সাথে সাথে তিনি হযরত মুফতী শফী সাহেব রহ.-কে ডেকে আনার জন্য এক ব্যক্তিকে দৌড়ে পাঠালেন। ঐ ব্যক্তি মুফতী সাহেব রহ. এর কাছে পৌঁছে বললেন, হযরতজী আপনাকে ডাকছেন। আব্বাজান বললেন, ডাক্তারগণ যেহেতু দেখা করতে নিষেধ করেছেন তাই দেখা না করাই ভাল।

লোকটি বলল, হযরতজী আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তভাবে আদেশ করেছেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে আস। হযরত মুফতী শফী সাহেব রহ. বলেন, আমি ফিরে এসে হযরতের পাশে বসলাম এবং হযরতের অবস্থা জেনে নিলাম। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. আমার হাত ধরে অঝোরে কান্না শুরু করে দিলেন।

হযরত মুফতী শফী সাহেব রহ. বলেন, আমি ভাবলাম হযরত অসুস্থতায় হয়ত মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। এজন্যে আমি সান্তনামূলক কিছু কথা বললাম। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ. বললেন, আমি অসুস্থতার ধরুন কাঁদছি না।

আমি দু'টি চিন্তায় চিন্তিত

বরং আমি দু'টি চিন্তা ও দু'টি শঙ্কায় ভুগছি। আর এ জন্যেই আমি কাঁদছি। আব্বাজান জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কী আশংকা হচ্ছে। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. বললেন, প্রথম কথা হল তাবলীগ জামাতের কাজ দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ এর ফলাফলও ভাল দেখছি। দলে দলে মানুষ আসছে। এখন আমার ভয় হচ্ছে, তাবলীগ জামাতের এ সফলতা এমন নয় তো যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইসতিদরাজ'। ইসতিদরাজ বলা হয় কোন বাতিলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড় দেয়া এবং তার বাহ্যিক সফলতা অর্জন হওয়া। বরং বাস্তবে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ নয়। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ. কোন পর্যায়ে বুযূর্গ ছিলেন। তার এ ভয় হচ্ছিল যে, তাবলীগ জামাতের কার্যক্রম ও সফলতা আবার ইসতিদরাজ হয় কি না।

এ কাজ ইসতিদরাজ নয়

হযরত আব্বাজান বললেন, আমি সাথে সাথে বললাম, হযরত! আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তাবলীগ জামাতের কার্যক্রম ইসতিদরাজ নয়। হযরত বললেন, আপনার কাছে এর কী প্রমাণ আছে যে, এ কাজ ইসতিদরাজ নয়?

আব্বাজান বললেন, এর প্রমাণ হল, কোন ব্যক্তিকে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড় দেয়া হয় তখন তার মন মস্তিস্কে এ ধারণা আসে না যে, এটা ইসতিদরাজ। এবং তার মনে ইসতিদরাজের কোন ভাবনাও আসে না। আর যেহেতু আপনার মনে ইসতিদরাজের আশংকা হচ্ছে। তো এ ভাবনাই প্রমাণ করে যে, এটা ইসতিদরাজ নয়। যদি এ কাজ ইসতিদরাজ হত তবে কখনোই আপনার অন্তরে এ আশংকা জাগ্রত হত না। সুতরাং আমি

আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, এটা ইসতিদরাজ নয়। বরং এটা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য। আব্বাজান বলেন, আমার এ উত্তর শুনে তাঁর চেহারায় প্রফুল্লতা ফুটে উঠল। তিনি বলেন, আলহামদুল্লিাহ আপনার কথায় আমি বড়ই প্রশান্তি লাভ করেছি।

দ্বিতীয় আশংকা

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ. বলেন, আমার দ্বিতীয় আশংকা হল, তাবলীগ জামাতে সাধারণ মুসলমানের আগমনই বেশী। ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা খুবই সামান্য। আমার ভয় হয়, যখন সাধারণ মানুষের হাতে এর জিম্মাদারী আসবে, ভবিষ্যতে তারা আবার এ কাজকে ভুল পথে নিয়ে যায় কিনা? যার দায়ভার আমার ঘাড়ে চাপবে। এজন্যে আমার আন্তরিক ইচ্ছা হল, ওলামায়ে কেরাম অধিক হারে এ জামাতে অংশগ্রহণ করবেন এবং তাঁরাই এর জিম্মাদারী গ্রহণ করবেন। আব্বাজান বললেন, আপনার এ চিন্তা সম্পূর্ণ সঠিক। আপনি তো এ কাজকে ভাল উদ্দেশ্যে সঠিক পন্থায় শুরু করেছেন। এখন যদি কেউ ভবিষ্যতে একে ভুল পথে পরিচালিত করে তবে তার দায়ভার আপনার উপর আসবে না ইনশাআল্লাহ। আসলে একথা সত্যি যে ওলামায়ে কেরামের উচিত এগিয়ে এসে এ কাজের জিম্মাদারী গ্রহণ করা।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ. এর এ ঘটনা আমি আব্বাজানের কাছে বহুবার শুনেছি। এর দ্বারা আপনারা অনুমান করতে পারবেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ. ইখলাস ও তাকওয়ার কেমন এক সাগর ছিলেন এবং তাঁর দ্বীনি জযবা কেমন ছিল।

তাবলীগ জামাতের বিরোধিতা কোনক্রমেই জায়েয নেই

এখন বাস্তবতা হল, এমন কিছু হযরতের হাতে বেশীরভাগ সময় এর জিম্মাদারী থাকে যাদের ইলমের গভীরতা নেই। এজন্যে মাঝে মাঝে তাদের থেকে কিছু অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। এ অসঙ্গতির কারণে তাবলীগ জামাতের বিরোধিতা করা বৈধ নয়। কেননা, সামগ্রিকভাবে তাবলীগ জামাতের কার্যক্রম বড়ই উত্তম ও প্রশংসনীয়। তাই আমাদের উচিত এর সহযোগিতা করা। যথাসম্ভব ওলামায়ে কেরামের এ জামাতে অংশগ্রহণ

করা। এবং এর সহযোগিতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। কিছু ওলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য এটা হতে হবে, যেন তাবলীগ জামাতের মাঝে সৃষ্টি অসঙ্গতিগুলো দূরীভূত হয়। কাজেই যে সকল ওলামায়ে কেরাম এ কাজে অংশগ্রহণ করবেন তাদের এ চিন্তা ও ফিকির মাথায় রাখতে হবে, আমরা একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অংশগ্রহণ করছি। আমাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করার পাশাপাশি যথাসম্ভব এ মুবারক জামাতকে ভুল পথ থেকে বিরত রাখতে হবে। এমন যেন না হয়, ওলামায়ে কেরামও তাদের অসঙ্গতির স্রোতে ভেসে যান।

তাবলীগ জামাতের অসঙ্গতি

উদাহরণ স্বরূপ বলছি! তাবলীগ জামাতের একটি বিশেষ অসঙ্গতি হল, পূর্বে এমন হত যে তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীগণ ও সাধারণ তাবলীগী ভাইয়েরা ফতোয়ার ব্যাপারে মুফতীয়ানে কেরামের নিকট যেতেন। কিন্তু আজকাল সেখানেও ফতোয়া দেয়া শুরু হয়েছে। মাসায়েলের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে উম্মতের সাথে মতপার্থক্যের ভাবও সৃষ্টি হয়ে গেছে। অনেকে তো বিচ্ছিন্নতার কথাও বলা শুরু করেছেন। যেমন এখন বলা হচ্ছে, তাবলীগী ভাইদের উচিত এমন মুফতী সাহেবের নিকট ফতোয়া চাওয়া যিনি তাবলীগ করেন। অন্য কোন মুফতী সাহেবের নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞাস করা ঠিক নয়।

কোন কোন সময় তাবলীগের মুরুব্বীগণ এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা শরীয়ত সম্মত নয়। উদাহরণ স্বরূপ দাওয়াত ও তাবলীগ ফরযে আইন না কি ফরযে কেফায়া? এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, দাওয়াত ও তাবলীগ শুধু ফরযে আইন তা নয় বরং নির্ধারিত এ পদ্ধতিতে করাই ফরযে আইন। যে এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে করবে না সে ফরযে আইনকে ছেড়ে দিল। এ জাতীয় কথাও বড় আপত্তিকর। এমনিভাবে জিহাদের ব্যাপারেও নানা ধরণের আপত্তিকর কথা শুনা যায়।

ছাত্ররা তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণ করবে

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে তাবলীগে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকি। কেননা তাবলীগে যাওয়া নিজের সংশোধনের জন্য বড়ই উপকারী। কারণ এর মাধ্যমে সহজেই নেককারদের সান্নিধ্য লাভ

করা যায়। নিজের দূর্বলতা দূর করা ও আত্মশুদ্ধির সুযোগ পাওয়া যায়। আমরা এমনও দেখেছি মাদরাসায় আট দশ বছর পড়ার পরও ফাযায়েলে আমলের এতটুকু গুরুত্ব অনুধাবন হয় না যতটুকু হয় এক চিল্লা দেয়ার দ্বারা। ছাত্ররা এর মাধ্যমে আমলের ব্যাপারেও মনোযোগী হয়ে উঠে। এটা অনেক বড় নেয়ামত। এজন্য তাবলীগ জামাতে সময় দেয়ার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকি।

কিন্তু তাবলীগে সময় লাগানোর পাশাপাশি ছাত্রদের খেয়াল রাখতে হবে, যেন তাবলীগ জামাতের অসঙ্গতিগুলোতে নিজে জড়িয়ে না যাই বরং সেগুলো দূর করার চিন্তা করি। এমন যেন না হয় সে নিজেই সেই স্রোতে ভেসে যায় এবং তাদের সুরে সুর মিলায়। 'লবনের খনীতে পড়লে লবনই হয়ে যায়' এমন যেন না হয়।

এ হল তাবলীগ জামাতের আসল অবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ এ সকল আপত্তিকর বিষয় থাকা সত্ত্বেও তাবলীগ জামাতে মধ্যে এখনও ভাল দিকটা প্রবল। সামগ্রিকভাবে এর দ্বারা ব্যাপক উপকারও হচ্ছে। তাই আমাদের বেশী বেশী তাতে অংশগ্রহণ করা উচিত এবং তাদের সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু সে সকল আপত্তিকর বিষয়গুলোর দিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে অবস্থা হল এমন, যখনই কেউ আপত্তিকর বিষয়গুলোর সংশোধনের চেষ্টা করে, তখনই তার নামে তাবলীগ বিরোধীতার অপপ্রচার শুরু হয়ে যায়। এটা খুবই ভয়ানক ও বিপদজনক কথা।

বর্তমানে সংঘটিত জিহাদগুলো আক্রমণাত্মক না আত্মরক্ষামূলক

একজন তালিবে ইলম প্রশ্ন করেছেন, বর্তমানের জিহাদগুলো আক্রমণাত্মক না আত্মরক্ষামূলক। উত্তর হল, বর্তমানের সকল জিহাদ যেমন বসনিয়া, কাশ্মীরে হচ্ছে সবই আত্মরক্ষামূলক। কাফিররা বসনিয়ার মুসলমানদের আক্রমণ করে তাদের উপর অত্যাচার করলে তাদের মোকাবেলায় মুসলমানরা আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র তুলে নিল। কাশ্মীরের অবস্থা হল, ভারত অন্যায়ভাবে কাশ্মীরকে দখল করে রেখেছে দেশ বিভক্তির সময় কথা ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকার সাথে কাশ্মীর সম্পৃক্ত থাকবে। সে মতে

কাশ্মীর পাকিস্তানের আংশ। কিন্তু ভারত অন্যায়ভাবে তা দখল করে রেখেছে। এজন্যই কাশ্মীরকে 'দখলকৃত' বলা হয়। সেখানকার মুসলমানরা ভারতীয় কাফেরদের দখলদারীত্ব থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে যে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে তা আত্মরক্ষামূলক জিহাদ।

আলোচিত কথাগুলোকে উল্টো বুঝবেন না

তাবলীগ জামাত প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত কথাগুলো ভালভাবে বুঝে নেয়া উচিত। কারণ অনেক সময় এমন হয় কোন কথা কোন সভা বা মজলিসে আলোচনা করা হলে, ভুল বুঝে কোন প্রকার সাবধানতা ছাড়াই অন্যের নিকট ভুলই ব্যক্ত করা হয়। আবার কখনো কথার একাংশ বলা হয়। দ্বিতীয় অংশ অবর্ণনীয় থেকে যায়। ফলে সংশোধন তো হয়ই না বরং ফিতনার সৃষ্টি হয়।

আপনাদেরকে কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল, আপনারা এখন দরসে নিজামী হতে অবসর গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। তাই আপনাদের উচিত প্রত্যেকটি বিষয়কে স্বস্থানে রেখেই তার মূল উৎস খুজে বের করা এবং সে অনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ করা। এ জন্য কথাগুলো আপনাদেরকে বলা হল। তবে কারো একথা বলা উচিত হবে না যে আমি তাবলীগ বিরোধী।

তাবলীগ জামাত নিষ্পাপ নয়

মোটকথা, আপনাদেরকে স্পষ্টভাবে বলছি, তাবলীগ জামাতের মাঝে ভালোর দিকটাই প্রবল। তাই একে গনীমত মনে করা এবং সহযোগিতা করা উচিত। তবে ভালোর দিকটা প্রবল একথার অর্থ এই নয় যে তাবলীগ জামাত নিষ্পাপ। তাদের কোন ভূলক্রুটি নেই। অথবা অসঙ্গতি কিছুই নেই।

ওলামায়ে কেরাম দ্বীনের প্রহরী

ওলামায়ে কেরাম হলেন দ্বীনের প্রহরী। 'আমরাতো তালিবে ইলম'। আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে কেরামকে দ্বীনের প্রহরী বানিয়েছেন। একবার আমি একজনের সাথে এ জাতীয় কিছু কথা বলছিলমা। উত্তরে তিনি বললেন, "এ মৌলভীতো ইসলামের ঠিকাদার হয়ে গেছেন। তিনি যেটাকে বলবেন 'এটা ইসলাম' সেটাই ইসলাম। যেটাকে বলবেন, 'এটা ইসলাম নয়' সেটাই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়"। উত্তরে আমি তাকে বললাম, কেউ তো

ইসলামের ঠিকাদার হতে পারে না। তবে আমরা দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী। প্রহরীর দায়িত্ব হল, যদি রাজপুত্রও রাজ দরবারে প্রবেশ করতে চায় কিন্তু তার নিকট প্রবেশপত্র না থাকে। তাহলে তাকে বাঁধা প্রদান করবে। অথচ প্রহরীর ভালভাবেই জানা আছে, আমি একজন প্রহরী মাত্র। আর ইনি হলেন শাহজাদা। কিন্তু প্রহরীর দায়িত্ব হল, অনুমতি ছাড়া যদি রাজপুত্রও রাজ দরবারে প্রবেশ করতে চায়, প্রহরী তাকে বাঁধা প্রদান করবে। তদ্রুপ আমরা দ্বীনের ঠিকাদার নই বরং আমরা দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী। আমাদের কাজ হল সংশোধন করা। কিন্তু আপনার সম্মান ও মর্যাদা আমাদের শিরোধার্য তবে প্রহরী হিসেবে আমাদের একথা বলতেই হবে যে, আপনার এ কাজ সঠিক নয়।

শেষ কথা

আপনারা এখন ওলামায়ে কেরাম। দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী। আপনাদের দায়িত্ব হল, দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি বর্জন করে দ্বীনের মেজাজ ও মনসা অনুযায়ী কাজ করা। 'সবাই করে তাই করি', 'বড়রা করে গেছেন তাই করছি', 'সবাই আমার বিরোধিতা করবে' এ ধরণের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়া আপনাদের শান নয়, নায়েবে নবীর কাজ নয়। সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, আপনারাই দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী। দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালা আপনাদের মাধ্যমে হেফাজত করবেন।

আল্লাহ আমাদের কথাগুলো বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন[১]।

সমাপ্ত

১. 'শেষ কথা' অংশটি মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই। অনুবাদকের ব্যথিত হৃদয়ের আকুল আবেদন হিসেবে সংযোজিত হল।

..... আমার দ্বিতীয় আশংকা হল, তাবলীগ জামাতে সাধারণ মুসলমানের আগমনই বেশী। ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা খুবই সামান্য। আমার ভয় হয়, যখন সাধারণ মানুষের হাতে এর জিম্মাদারী আসবে, ভবিষ্যতে তারা আবার এ কাজকে ভুল পথে নিয়ে যায় কিনা? যার দায়ভার আমার ঘাড়ে চাপবে। এজন্যে আমার আন্তরিক ইচ্ছা হল, ওলামায়ে কেরাম অধিক হারে এ জামাতে অংশগ্রহণ করবেন এবং তাঁরাই এর জিম্মাদারী গ্রহণ করবেন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ.

..... কিন্তু তাবলীগে সময় লাগানোর পাশাপাশি ছাত্রদের খেয়াল রাখতে হবে, যেন তাবলীগ জামাতের অসঙ্গতিগুলোতে নিজে জড়িয়ে না যাই বরং সেগুলো দূর করার চিন্তা করি। এমন যেন না হয় সে নিজেই সেই স্রোতে ভেসে যায় এবং তাদের সুরে সুর মিলায়। 'লবনের খনীতে পড়লে লবনই হয়ে যায়' এমন যেন না হয়। .....

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী

প্রকাশনায়
ইদ্‌রীসিয়া কুতুবখানা
মাদ্‌রাসা রোড, মাদানীনগর, সানারপাড়, নারায়ণগঞ্জ

Designed by : An-Noor : 01712510726